



প্রশস্ত হোক কর্মমুখী শিক্ষার পথ

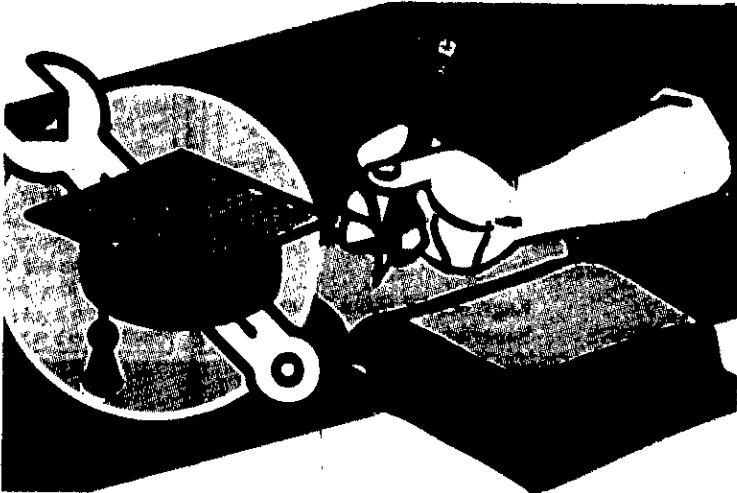
ড. আর এম দেবনাথ

ব লা যায় পুরো পাকিস্তান আমলেই (১৯৭৪-৭১) স্কুল, কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য লড়াই করতে হতো না। মোটামুটি ইচ্ছেমতো ভর্তি হওয়া যেতো। একইভাবে একটা ডিগ্রি থাকলে চাকরিরও কোনো অসুবিধা হতো না। গ্র্যাজুয়েট অথবা পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি থাকলে একটা চাকরি হয়েই যেতো। এর জন্য টাকা খরচ করতে হতো না। তখন উচ্চশিক্ষার তাই বড় কদর ছিল। স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তে তো থানায় থানায় কলেজ খোলার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ডিগ্রি কলেজ চাই। তখনকার সময়ের কথাই ছিল ঘরে ঘরে বিএ-এমএ চাই। যতো বেশি উচ্চশিক্ষা ততোবেশি সংস্কৃতিবান জাতি। এ কারণে উচ্চশিক্ষার বড় কদর ছিল।

আজকের দিনে? এখন উচ্চশিক্ষার বেশ প্রসার ঘটেছে। বিএ-এমএ ডিগ্রি নেয়া এখন অনেক সহজ। 'বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ' যেখানে মাস্টার্স ডিগ্রি পড়ানো হয় তার কোনো অভাব নেই। সরকারি সুযোগ-সুবিধার পাশপাশি রয়েছে এখন উজ্জ্বল উজ্জ্বল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যেখান থেকে অল্প আয়াসে ডিগ্রি নেয়া যায়। এ কারণে বিএ-এমএ পাস ছেলেমেয়ের কোনো অভাব নেই। কিন্তু অভাব আছে চাকরির। আগের জমানা এখন নেই। চাকরি এখন সোনার হরিণ। এ কারণেই কী নাগরিকদের বিরাট অংশের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে? খবরের কাগজের একটা প্রতিবেদন (১৬.১.১৬) পাঠ করে এ কথাই বলতে হয়। খবরটি প্রবাসীদের ওপর। কিন্তু প্রবাসীদের ওপর 'স্টোরি' করতে গিয়ে প্রতিবেদক স্থানীয়ভাবে অভিবাসীদেরকে যোগ করে দেখিয়েছে যে, প্রবাসীরা যেমন উচ্চশিক্ষার পেছনে পড়ছে তেমনি পেছনে পড়ছে দেশের ভেতরের অভিবাসী পরিবারগুলোও। স্টোরিটির মতে বাংলাদেশি যারা বিদেশে কাজ করে তারা 'মাইগ্রেণ্ট'। তেমনি যারা পোশাক শিল্পে কাজ করে তারাও অভ্যন্তরীণভাবে মাইগ্রেণ্ট। এই উভয় ধরনের পরিবারের মধ্যেই উচ্চশিক্ষায় আগ্রহ কম। এই স্টোরিটির ভিত্তি কী? ভিত্তি একটা গবেষণা যেটি করেছে 'সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড কো-অপারেশন (এসডিসি) ও রিফিউজি এ্যান্ড মাইগ্রেণ্টরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) যৌথভাবে। গবেষণায় বলছে প্রবাসী শ্রমিকের পরিবারে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি রয়েছে মাত্র শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ সদস্যের। এদিকে অভ্যন্তরীণ অভিবাসী শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি রয়েছে মাত্র এক শতাংশের। বলা হয়েছে এই অনাগ্রহের পেছনে রয়েছে চাকরি পাওয়ার অনিশ্চয়তা। অর্থাৎ চাকরির সাথে সম্পর্কিত হয়ে উঠছে উচ্চশিক্ষা। এটা কতো শতাংশ লোকের মধ্যে? মোটামুটি বলা যায়। বিরাট অংশের নাগরিকদের মধ্যে এই ধারণা বহুমূল হয়ে উঠেছে। দেশের বাইরে কমপক্ষে এক-সোয়া কোটি লোক কাজ করে। প্রতি পরিবারের আকার 'চারজন' ধরলে এখানে হবে চার-পাঁচ কোটি লোক। অভ্যন্তরীণভাবে অভিবাসী অর্থাৎ পোশাক শ্রমিকদের সংখ্যা কতের পক্ষে ৩০-৪০ লাখ। এদের পরিবারও যদি হয় 'চারজন' তাহলে এখানে হয় এক-দুই কোটি লোক।

এই দুই গ্রুপ মিলিয়ে হয় মোটামুটি পাঁচ-সাত কোটি লোক। এতেই হয় দেশের এক তৃতীয়াংশ লোক। তবে কথা আছে। যে ধারণা প্রবাসী ও অভ্যন্তরীণভাবে অভিবাসীদের উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে হচ্ছে সেই একই ধারণা সমানের নিচে বসবাসকারীদের মধ্যেও হচ্ছে। এমনকী নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও অধিবিত্তের মধ্যেও একই ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে বলে মনে হয়। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও তাই। আমি একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে যাই। সেখানে 'রিসেপশনে' কাজ করে গ্র্যাজুয়েট ও মাস্টার্স ডিগ্রিহোস্তরা খালি চাকরি চায়। অপরদিকে দেখা যায় ফ্ল্যাট বাড়ি কমপ্লেক্সগুলোতে

দেখা যাচ্ছে সাধারণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার প্রতিযোগিতা। কয়েকদিন পূর্বেও দেখলাম সরকার বেসরকারি খাতে পাঁচটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে, লক্ষণীয় বিষয়, আজকাল বিবিএ ও এমবিএ পড়ানোর আধিক্য। এক সময় 'কমার্সকে' অন্যান্য ডিসিপ্লিনের ছেলেরা বলতো 'কম কম আর্টস'। অর্থাৎ কমার্সের মূল্য ছিল সর্বনিম্নে। বিধাতার কী খেলা বাজার অর্থনীতির ফলে এখন শুধুই কমার্স-বিবিএ আর এমবিএ। বিজ্ঞানে ছাত্র নেই, অংকে ছাত্র নেই, ইংরেজিতে ছাত্র নেই—এমনকী নিজ ভাষা বাংলাতেও ছাত্র নেই। সবাই কম কম আর্টস।



আমাদের শিল্পখাতে প্রচুর বিদেশি কাজ করে। তাদের কাজের এরিয়া হচ্ছে মার্কেটিং, ফিন্যান্স, প্রোডাকশন, ইন্টারনাল কন্ট্রোল, একাউন্টস ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে পাস করা আমাদের ছেলেমেয়েরা বেকার কেন? এর উত্তর সিলেবাস এবং পড়ানোর পদ্ধতিতে

'প্রাস্কার', বৈদ্যুতিক মিশ্রি ইত্যাদি শ্রেণির লোকদের চাকরির কোনো অভাব নেই। দেশেও তাদের কাজের সুযোগ আছে, বিদেশেও তারা যেতে পারে অনায়াসে। তাদের রোজগারও ভালো। গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় একই অবস্থা। সাধারণ বিএ-এমএ পাস ছাত্র-ছাত্রীদের তদবির কেবল চাকরির জন্য। এসব দেখে অনেক ছেলে-মেয়ে লেখাপড়ায় উৎসাহিত হয় না, বিশেষ করে প্রবাসীদের আত্মীয়-স্বজন। তাদের লেখাপড়ার চেয়ে উৎসাহ বেশি বিদেশ গমনের জন্য। আগে তারা কম লেখাপড়ায় যেতো। ইদানীং তাদের মধ্যে 'টেকনিক্যাল' শিক্ষা নেয়ার প্রবণতা বেড়েছে। কারণ একজন ড্রাইভার, বৈদ্যুতিক মিশ্রি, প্রাস্কার এবং এ শ্রেণির দক্ষ শ্রমিকের চাকরি বিদেশে সুলভ এবং তাতে রোজগারও অনেক বেশি।

মজার বিষয় মাঠ পর্যায়ে যখন এসব ঘটছে তখন সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে

কিন্তু আমরা খবর পাচ্ছি না এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ-এমবিএদের মধ্যে চাকরি পাচ্ছে কজন? এই তথ্যটি দরকার। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েরা কেমন করছে তাও জানা দরকার। সবচেয়ে বড় কথা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ। তাদের নিজস্ব ফ্যাকাল্টি নেই, নিজস্ব ভবন নেই, গ্রন্থাগার নেই। নিয়মিত পরীক্ষা খাতা দেখা নেই। শুধুই ডিগ্রি বেচা-কেনা। এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা কী অপচয়মূলক নয়? বিশেষ করে যখন সাধারণ লোকেরা উচ্চশিক্ষায় উৎসাহ হারাচ্ছে। লেখাপড়ার সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পর্ক থাকবে, না হয় চাকরির। চাকরির সুযোগও হলো না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো ব্যবস্থা হলো না এমন একটা উপরি কাঠামোসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার কী উপযোগিতা? যেমন ধরা যাক নার্সের পেশা। পরিষ্কার দেখা যায় মেডিক্যাল কলেজ ও

হাসপাতালগুলোতে নার্সের ভীষণ অভাব। ইনজেকশন 'পুশ' করার মতো সেবিকা নেই। রান্ধ প্রেসার মাপার লোক নেই। সরকার এদিকে নজর দিচ্ছে না কেনো। নজর দেয়া উচিত। কারণ দৈনিক ইত্তেফাকে (২৩.১০.১৫) একটি স্টোরি ছাপা হয়েছিল যাতে বলা হয়েছিল যুব বেকারত্ব বাড়ছে। তিনটি সূত্র ব্যবহার করে বলা হয়েছিল কীভাবে তা বাড়ছে। বিশ্বব্যাংকের মতে ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী যুবকদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা ৪২ লক্ষ ২৩ হাজার। এদিকে 'আইএলও'র মতে বেকারের সংখ্যা ৪৫ লক্ষ ১০ হাজার। আর আমাদের 'বিসিএমের' মতে ২০০৯ সালে তা ছিল ৫ দশমিক ১ শতাংশ। সেই রিপোর্টটিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে প্রতিবছর উচ্চশিক্ষা নিয়ে শ্রমবাজারে আসা শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেক তরুণই বেকার থাকছেন বা যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি পাচ্ছেন না। এই যদি হয় বাস্তবতা তা হলে করণীয় কী? করণীয় 'টেকনিক্যালি কমপিটেন্ট' ব্যবস্থাপক, শ্রমিক তৈরি করা। সারা দেশে বিভিন্ন ধরনের টেকনিক্যাল স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করা। বেসরকারি খাত এটা করছে না। আমি একটা বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা জানি। তারা যেসব বই পড়ায় তাতে উদাহরণ সব আমেরিকার। আমেরিকার কাপড়ের দোকানের কী সমস্যা, সেখানকার শ্রমজীবীদের কী সমস্যা ইত্যাদি ইত্যাদি। বাংলাদেশের কোনো উদাহরণ নেই। আমাদের পোশাক শিল্পে লক্ষ সমস্যা আছে। তার ওপর ভিত্তি করে প্রচুর বই লেখা হতে পারে। সেগুলো পাঠ্যপুস্তক হতে পারে। না, এসব হচ্ছে না। বস্ত্রখাতে, ওষুধ শিল্পে, কম্পিউটার শিল্পসহ লক্ষ খাতে আমাদের প্রচুর শিল্প-কারখানা হয়েছে। এসবের মালিকদের অভিযোগ তারা দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিক, ব্যবস্থাপক পাচ্ছেন না। সরকারের নজর দেয়া উচিত এসব চাহিদা মেটানোতে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে নীতি-নির্ধারকদের নজর বিএ-এমএ তৈরিতে। অথবা এমন 'এমবিএ' তৈরিতে যারা অনেক বিশ্ববিদ্যালয় চেনে, কচুরিপানা চেনে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচিত এসবে উৎসাহ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যদি কর্মমুখী হয় তাহলে কেউ উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ হারাতে না। কারণ এই ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জন ও কর্মমুখী হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা হাজার হাজার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের বোঝা বাড়িচ্ছি। শুধু অভিবাসী নয়, যাতে সকল শ্রেণির নাগরিকই শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আস্থা রাখে তার ব্যবস্থা করা দরকার। পরিশেষে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাছে একটা প্রশ্ন: আমাদের শিল্পখাতে প্রচুর বিদেশি কাজ করে। তাদের কাজের এরিয়া হচ্ছে মার্কেটিং, ফিন্যান্স, প্রোডাকশন, ইন্টারনাল কন্ট্রোল, একাউন্টস ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে পাস করা আমাদের ছেলেমেয়েরা বেকার কেন? এর উত্তর সিলেবাস এবং পড়ানোর পদ্ধতিতে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ ব্যাপারে ভাবলে দেশের উপকার হবে।

● লেখক: ম্যানেজমেন্ট ইকোনমিস্ট ও সাবেক শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়